বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

রচনা

হুমায়ূন কবীর ঢালী

প্রকাশনায়: অঙ্কুর প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রাককথন

জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার হাজার বছরের ইতিহাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ তথা বাঙালি জাতি এবং আমাদের সার্বভৌমত্ব ।

ইতিহাস থেকে আমরা পেয়েছি আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, জীবন-যাপনের ধরণ । সেই সাথে ইতিহাস সৃষ্টিতে যে কজন মহামানবের অবদান এই মাটি ও মানুষের আত্মার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের অন্যতম । তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ মানুষ । স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার । বাঙালি জাতির জনক ।

তিনি স্বীয় মেধা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর একটি সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে এ দেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন । বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে এই মহানায়কের জীবন পদে পদে হয়েছে বিপন্ন । তথাপি তিনি কখনো স্বাধীকারের প্রশ্নে, স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ করেননি পাকিস্তান শাসকদের সঙ্গে । তিনি গতানুগতিক রাজনীতির ধারাকে পাল্টে দিয়ে রাজনীতিকে আধুনিক ধারায় প্রবাহিত করেছেন ।

শেখ মুজিব উঠে এসেছেন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে । তার আগে বিশেষ করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এ অঞ্চলের রাজনীতির নেতৃত্ব ছিল মূলত উচ্চবিত্তদের দখলে । বলা যায় এই ধারাকে ভেঙে শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসেন । তিনি ছিলেন সকলের মুজিব ভাই । শেখ মুজিবুর রহমান মনে করতেন এতে কর্মীদের সাথে নেতাদের দূরত্ব কমে যায়, কর্মীদের সুখ দুঃখের কথা জানা যায় । কর্মীদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন তিনি । তিনি যখন জেলখানায় ছিলেন এবং তার সাথে যেসব কর্মী জেলে ছিলেন, তাদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা, তাদের খাওয়া দাওয়া দেয়াসহ সব ধরনের খোঁজ-খবর নিতেন ।

শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর জীবনের প্রতিটি পলে পলে শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে । তিনি জেল-জুলুম-হুলিয়া নির্যাতন মাথায় নিয়ে বাঙালি জাতির জন্যে কেঁদেছেন, যুদ্ধ করেছেন । অবশেষে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন । একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন ।

এই গ্রন্থে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন-ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে বর্ণনার চেষ্টা করেছি সহজ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ।

আশা করি বইটি ছোটবড় সব বয়সের পাঠককে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানতে সহায়ক হবে ।

হুমায়ূন কবীর ঢালী

ফরিদাবাদ, ঢাকা

বিশেষ কথন: *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়* গ্রন্থতি গতবছর অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে প্রকাশ হয়। আজ ১৫ আগস্ট ২০০৯ এই গ্রন্থের ইন্টারনেট সংস্করণ আগামী প্রজন্মের জন্য বিনা মূল্যে অবমুক্ত করা হলো। আশা করছি, শিশ-কিশোররা বইটি পড়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে।

এই বইয়ের যে কোনো অংশ, উদ্বৃতি আমার নাম ব্যবহার পূর্বক ব্যবহার করা যাবে।

শেখ মুজিবের ছেলেবেলা

নদীর নাম মধুমতি। বাইগার তারই একটি শাখা। বাইগার এর তীরে পাটগাতি ইউনিয়ন। টুঙ্গিপাড়া এই ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী। সাবেক মহকুমা, বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত।

ছায়াঘেরা পাখি ডাকা সবুজ সুন্দর একটি গ্রাম। বাংলার আর দশটা গ্রামের মতোই প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য উপচে পড়ে এই গ্রামে। সেই গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবারে শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। ৩ চৈত্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ১৭ মার্চ ১৯২০ সাল, মঙ্গলবার রাত ৮টায়।

তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সাহেরা বেগম। ৪ বোন ও ২ ভাইয়ের মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন তৃতীয়। তাঁর একমাত্র কনিষ্ঠ ভাই শেখ নাসের। বোনদের সবাই ছিলেন তাঁর বড়।

কথিত আছে, শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব পুরুষ ছিলেন দরবেশ শেখ আউয়াল। যিনি মুঘল শাসন আমলে বাগদাদ থেকে চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁয় আসেন ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে। শেখ আউয়ালের পুত্রের নাম শেখ জহিরউদ্দিন এবং তদীয় পুত্র শেখ জান মাহমুদ ওরফে তেকড়ি শেখ। শেখ জান মাহমুদের পুত্র শেখ বোরহান উদ্দিন ছিলেন পেশায় ব্যবসায়ী। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তিনি প্রায়ই আসতেন গোপালগঞ্জের গিমাডাংগায়। গিমাডাংগা লাগোয়া টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। শেখ বোরহান উদ্দিন এই টুঙ্গিপাড়ার বনেদী পরিবার কাজী বাড়িতে বিয়ের

সূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। শেখ বোরহান উদ্দিনের পুত্র শেখ আকরাম। তদীয় পুত্র শেখ আবদুল হামিদ। শেখ আবদুল হামিদের পুত্র লুৎফর রহমান অর্থাৎ শেখ মুজিবের পিতা। শেখ লুৎফর রহমান সিভিল কোর্টের একজন সেরেস্তাদারের চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন স্পষ্ট ভাষী, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। শেখ মুজিবের জীবনে পিতার আদর্শ বিরাট ভূমিকা রেখেছে। অন্যায়, অসত্য, নির্যাতন, ভয়-ভীতির কাছে কখনও মাথা নত করেন নি শেখ লুৎফর রহমান।

টুঙ্গিপাড়ার শ্যামল পরিবেশে শেখ মুজিবের জীবন কাটে দুরন্তপনা করে। শেখ মুজিব শেখাপড়া শুরু করেন অনেকটা দেরিতে। যখন তাঁর বয়স নয় কি দশ, তখন গৃহ শিক্ষক পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহর কাছে লেখাপড়ার হাতেখড়ি নেন। এরপর টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং টুঙ্গিপাড়ার গীমাতা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন।

শেখ লুৎফর রহমান জানতেন পুত্র মুজিব ডানপিটে ও দুরন্ত। তারপরও ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে তিনি ছিলেন বেশ আশাবাদী। তাই নিজ কর্মস্থল মাদারীপুরে নিয়ে এলেন শেখ মুজিবকে। এটা ১৯৩১ সালের কথা। ভর্তি করলেন মাদারীপুর ইসলামিয়া হাই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে। এখানে বছর দেড়েক যেতে না যেতেই শেখ মুজিব আক্রান্ত হলেন বেরিবেরি রোগে। এই রোগ থেকে চোখের ভীষণ অসুখ দেখা দিল। যার নাম 'গ্লোফুমা'। ফলে মুজিবের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় চার বছরের জন্য। পুত্রের চিন্তায় শেখ লুৎফর রহমান ভেঙে পড়েন। ইতিমধ্যে তিনি মাদারীপুর থেকে গোপালগঞ্জে বদলি হন। গোপালগঞ্জে নিয়ে গেলেন শেখ মুজিবকে। সেখানে শুভাকাঙ্খিরা পরামর্শ দিলেন শেখ মুজিবকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। শেখ মুজিবকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন শেখ লুৎফর রহমান। কলকাতার চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. টি আহমদ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেখ মুজিবের চোখ অপারেশন করেন। অপারেশন সফল হলো। কিন্তু ডাক্তার শেখ মুজিবকে পরামর্শ দেন চশমা নেওয়ার জন্যে। শেখ মুজিব চশমা নিলেন।

অপারেশনের পর চোখ ভালো হয়ে যাওয়ার পর শেখ মুজিবকে গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। এই স্কুলে থাকাকালীন সময়েই শেখ মুজিবের প্রতিভা আর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। এমনিতেই ক্লাসের অন্য ছেলেদের থেকে শেখ মুজিব কিছুটা বয়স্ক। সেই সাথে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা সকলকে মুগ্ধ করে। সকলের প্রিয় পাত্রে পরিণত হন তিনি। তাঁর পরিচিতি বাড়তে থাকে 'মুজিব ভাই' হিসেবে।

ফুটবল শেখ মুজিবের পছন্দের একটি খেলা। কিন্তু খেলতেন ভলিবল। শরীরের ছিপছিপে লম্বা হ্যাংলা গড়ন তাকে ভলিবল খেলায় পারদর্শী হতে সাহায্য করেছিল। সে সময় গুরু সদয় দত্তের প্রবর্তিত 'ব্রতচারী নৃত্য' ছিল খুব প্রিয়। 'ব্রতচারী নৃত্য' সেকালের কিশোর তরুণদের দেশপ্রেমের মহান মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৯৩৯ সাল। শেখ মুজিব তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক আসেন গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল পরিদর্শনে। সঙ্গে আসেন খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুল পরিদর্শন শেষে তাঁরা ডাকবাংলোর দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পথে বাঁধা পেয়ে দাঁড়ালেন। কারণ, কয়েকটি ছেলে তাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। প্রধান শিক্ষক দ্রুত এগিয়ে এসে ছাত্রদের রাস্তা ছেড়ে দিতে বললেন।

প্রধান শিক্ষকের কথা অমান্য করে একেবারে প্রধানমন্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল লম্বা ছিপছিপে চেহারার একটি ছেলে। যার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। সকলের মুজিব ভাই। নির্ভয়ে মুজিব প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন, হোস্টেলের ছাদ দিয়ে বর্ষাকালে পানি পড়ে। এতে ছাত্রদের বইপত্র, বিছানা নষ্ট হয়ে যায়। মেরামতের ব্যবস্থা না করলে রাস্তা ছাড়া হবে না।

কিশোর ছাত্রের সৎসাহস আর স্পষ্টবাদীতায় মুগ্ধ হলেন ফজলুল হক। জানতে চাইলেন ছাদ মেরামত করতে কত টাকা লাগবে তাদের। দৃঢ়কণ্ঠে শেখ মুজিব বললেন, বারশ' টাকা লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তার তহবিল থেকে বারশ' টাকা মঞ্জুর করে অবিলম্বে ছাদ মেরামতের জন্য এসডিও সাহেবকে নির্দেশ দিলেন। শেখ মুজিবের কাঁধে হাত রেখে বললেন, আজ থেকে তুমি আমার নাতি। সেই থেকে ফজলুল হকের সঙ্গে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠতা হয়।

এখানে শেষ নয়, এতক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। শেখ মুজিবের সৎসাহস, কর্তব্যবোধ তাঁর মনোযোগ কাড়ল। ডাকবাংলোতে ফিরেই সোহরাওয়ার্দী লোক মারফত শেখ মুজিবকে ডেকে পাঠালেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে কিছুক্ষণ তাঁর কথা হলো। সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় শেখ মুজিবকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

স্কুল জীবনেই শেখ মুজিব প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। শেখ মুজিব যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাকে গ্রেফতার করা হয়। এক সভায় ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার সময় মিথ্যা অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয় পরে ছাত্রদের দাবির মুখে পুলিশ শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪০ সালে যোগ দেন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। তাকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।

১৯৪২ সালে মিশন স্কুল থেকে শেখ মুজিব প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

তার আগে ১৯৩৯ সালে ১৯ বছর বয়সে চাচাতো বোন ফজিলাতুন্নেসা রেনুর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি।

কলকাতায় শেখ মুজিব

১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেখ মুজিব কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হলেন। থাকার ব্যবস্থা হয় হোস্টেলে। সে সময় অখণ্ড ভারতের রাজনীতিতে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ছিল মুসলিম লীগ। আর মুসলিম লীগের অঙ্গ সংগঠনই ছিল 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ' এবং নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন'। শেখ মুজিব মিশন স্কুলে থাকাকালীন সময়েই এই দুই অঙ্গ সংগঠনের

কাউন্সিলার হয়েছেন। ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়েও তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর বিচক্ষণতা, নিষ্ঠা আর কর্তব্যপরায়ণতার গুণে ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগে তখন দুটি ধারা প্রবাহিত ছিল। একটি সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাসেমের নেতৃত্বে এবং অন্যটি আকরাম খাঁ-নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বে। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে কাজ করেন।
১৯৪৪ সালে তিনি আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। একই বছর কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগ দেন। শেখ মুজিব বিএ ক্লাসে ভর্তি হলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সময়। এ সময় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ দিবসে কলকাতার বেকার হোস্টেলের অদূরে পুলিশের গুলিবর্ষণে আবদুস সালাম নামে এক যুবক নিহত হলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর কর্মকাণ্ডের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। এ সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে উঠে।
১৯৪৫ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডের নির্বাচনে অংশ নেন। এ সময়ে বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী, নুরুদ্দিন আহমদ, জহিরুদ্দিন, আসরাফ উদ্দিন, কাজী আহমেদ কামাল প্রমূখসহ শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন দেন। সোহরাওয়ার্দী নির্বাচিত হন। উল্লেখ যে, ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও বঙ্গবন্ধুসহ মনোনীত সকল প্রার্থী জয়লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সালেহ আহমেদ সভাপতি এবং শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ইসলামিয়া কলেজ বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ নামে পরিচিত।
এ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান নেতাজী সুভাষ বসুর হল ওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনে যোগ দেন। তরুণ শেখ মুজিবের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের তাড়াতে হলে প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।
এ বছরই প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পক্ষ থেকে ফরিদপুরে নির্বাচনী প্রচারণার দায়িত্ব লাভ করেন। এই নির্বাচনী প্রচারণা করতে গিয়ে মুজিবকে সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হয়েছিল। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন শেখ মুজিব। শুধু তাই নয় এই নির্বাচনী প্রচারণা করতে গিয়ে শেখ মুজিব একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠেছিলেন। শেখ মুজিবের সাংগঠনিক তৎপরতা ও দক্ষতায় সোহরাওয়ার্দী রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।
১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট ছিল ভয়াবহ এক কলঙ্কজনক দিন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সেদিন কলকাতা শহরে এক প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। এই দাঙ্গা ইতিহাসে 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে অভিহিত হয়। শেখ মুজিব স্বীয় দলবল নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন দূর্গত এলাকায় রিলিফ বিতরণে অংশ নিলেন এবং বিহারের দাঙ্গাবিধস্ত এলাকা সফর করেন।
১৯৪৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে্াতক ডিগ্রী লাভ করেন। আগস্ট মাসে ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়। তখনও শেখ মুজিব কলকাতায় থেকে যান। তিনি ভারত ভাগের পক্ষে থাকলেও মুসলিম লীগের সাথে তাঁর মতভেদ সৃষ্টি হয়। সেপ্টেম্বরে শেখ মুজিব ইসলামিয়া কলেজ ও সিরাজ-উদ-দৌলা হলের ছাত্র নেতাদের নিয়ে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করা।

এরপর সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে শেখ মুজিব সিলেটে যান। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ সরকার ঘোষণা দিলেন, সিলেটের জনগণের ভোটের উপর নির্ভর করবে সিলেট ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের কোনটির সঙ্গে যুক্ত হবে। এরপর গণভোটের ফলে সিলেট জেলা পূর্ববঙ্গের গণভোটে ভালো প্রভাব ফেলেছিল। যদিও তখন ভারতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা ছাড়াও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এবং জামায়াতে ইসলামী অখণ্ড ভারতের সমর্থক ছিলেন। এদের সবরকম প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সিলেট জেলা পূর্ববঙ্গের সাথে অন্তর্ভুক্ত হলো।

অন্যদিকে বাংলাও ভাগ হলো। এক অংশ 'পূর্ববঙ্গ' অর্থাৎ বাংলাদেশের নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান। অন্য অংশ 'পশ্চিমবঙ্গ' নামে যুক্ত রইল ভারতের সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের রাজধানী হলো ঢাকা।

ঢাকায় এলেন শেখ মুজিব

ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তানের শাসনভার মুসলিম লীগের ওপর ন্যস্ত হলো। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। প্রধানমন্ত্রী হলেন লিয়াকত আলী খান। মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের অনবিজ্ঞতার কারণে ক্ষমতা কুক্ষিগত হলো আমলাদের হাতে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অবতীর্ণ হলেন এক নায়কের ভূমিকায়।

কলকাতায় শেখ মুজিব যখন ইসলামিয়া কলেজ ও সিরাজ-উদ-দৌলা হলের ছাত্র-যুবাদের নিয়ে গোপন বৈঠক করেছিলেন, তখই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, মুসলিম লীগ আসলে জনগণের মুক্তি চায় না, মুসলিম লীগ ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই প্রথম রাজনৈতিক চরিত্রের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল যুব সংগঠন, গণতান্ত্রিক যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৪৭ সালের ২০ ডিসেম্বর। ঢাকায় বলিয়াদী হাউজে মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্যে আইনসভার একটি উপদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব ওই অনাস্থা প্রস্তাবের নেতৃত্ব দেন।

১৯৪৮ সালে শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। জানুয়ারির ৪ তারিখে মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। হাজার হাজার ছাত্র যোগ দিলো এই সংগঠনে। এ বছরই বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। কারণ, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ।

২৩ ফেব্রুয়ারি আইন পরিষদে খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। সাথে সাথে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এই চক্রান্তের প্রতিবাদ করেন। সেই সাথে ২ মার্চ ফজলুল হক হলে গঠন করা হলো 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এই পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হলেন ছাত্রনেতা শামসুল আলম। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১১ মার্চ 'রাষ্ট্র ভাষা দাবী দিবস' ঘোষণা করে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট আহবান করেন। সফলভাবে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিব সচিবালয়ের গেটে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেফতার হন। শেখ মুজিবের গ্রেফতারে সারাদেশের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে মুসলিম লীগ সরকার শেখ মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দকে ১৫ মার্চ মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

২১ মার্চ তারিখে রমনা রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র এই ঘোষণার প্রতিবাদ করেন। ২৫ মার্চ কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ সাহেব ভাষা আন্দোলনকারীদের প্রতি কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখলে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে আন্দোলনের অন্যতম কর্মী শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলো বিশেষ ক্ষমতা আইনে। কারাগার থেকে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয় ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি।

মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিব এগিয়ে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিতে। কর্মচারীদের পক্ষ নিয়ে রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, সাধারণের কল্যাণে তিনি যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। যাহোক, কর্মচারীদের সঙ্গে ছাত্রদের একাত্মতার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দারুণ অচলাবস্থা বিরাজ করে।

কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট ভাঙতে শেখ মুজিবসহ ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর ওপর বহিস্কারাদেশসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। শেখ মুজিবের শাস্তি ছিল মুচলেকা এবং ১৪ টাকা জরিমানা অথবা চূড়ান্ত বহিস্কার। শেখ মুজিব মুচলেকা এবং জরিমানা দিতে রাজি হলেন না। ফলে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হয়। পরিণতিতে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠন

১৯৪৯ সালের ৩১ মার্চ শেখ মুজিব গোপালগঞ্জে গ্রেফতার হলেন। এ সময় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন ঢাকার টিকাটুলিতে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। সভাপতি মাওলানা

আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক সম্পাদক এবং শেখ মুজিব যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখনও শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পান নি। মুক্তি পান জুলাই মাসের শেষের দিকে ।

তখন সারাদেশে খাদ্য সংকট প্রকট আকার ধারণ করছিল। শেখ মুজিব খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে তিনি গ্রেফতার হন। অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় নূরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করেন। এ মাসের শেষ দিকে ঢাকার আরমানীটোলা থেকে এক ভূখা মিছিল শুরু হয় মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের বাস ভবনের উদ্দেশ্যে। মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং মিছিল থেকে মাওলানা ভাসানী, শামসুল হক ও শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। কিছুদিন পর মাওলানা ভাসানী ও শামসুল হককে ছেড়ে দিলেও শেখ মুজিবকে প্রায় দু'বছর জেলে আটক রাখে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এ দেশের রাজনীতিতে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটায়। ৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও ঘোষণা করেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। এই ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ৬ ফেব্রুয়ারি জেলখানায় অনশন শুরু করেন।

২০ ফেব্রুয়ারী সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্যে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। জনসভা মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

১৯৫২ ষালের ২১ ফেব্রুয়ারি। মাতৃভাষা বাংলার বিরুদ্ধে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বিরদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা। আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে সালাম, বরকত, রফিক, রফিক, জব্বার ও শফিউর রহমান প্রমুখ শহীদ হন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিব জেলখানায় পুনরায় আমরণ অনশন শুরু করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি মাওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের মুক্তির আবেদন জানিয়ে বিবৃত দেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এই বছরের শেষ দিকে চীনের রাজধানী বেইজিং এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে বেসরকারি সদস্য হিসেবে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে শেখ মুজিবও চীন সফর করেন। তখন চীনের চেয়ারম্যান ছিলেন মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড মাও সেতুং, প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই এবং চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল পদে কমরেড কু মো জো। এই বিশ্ব শান্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যেই সেদিন চীনা নেতৃবৃন্দের সাথে পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের সর্বপ্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয়। চীন থেকে ফিরে মাওলানা ভাসানী এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তিনি শেখ মুজিবকে স্থায়ীভাবে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেন। মাওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের নির্ভীক মনোভাব, একাগ্রতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, বাকপটু ও কর্মীদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেন। যদিও পরবর্তীতে নীতিগত কারণে সব বিষয়ে একমত হতে না পেরে দল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মাওলানা ভাসানী বলতেন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিবের মতো আর কাউকে তিনি পান নি।

১৯৫৪ সাতে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হলো সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ এবং যুক্তফ্রন্টের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা দাবিকে কার্যে পরিণত করার ওয়াদা ঘোষণা করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে।

শেখ মুজিব নিজেও গোপালগঞ্জ আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে ২৩৭ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩ টি আসন। এর মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ পায় ১৪৩টি আসন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করল। এ কে ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হলেন। শেখ মুজিব কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। মন্ত্রীসভা গঠনের কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতায় যান এ কে ফজলুল হক। কলিকাতার বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তিনি। খিদিরপুরের এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে হক সাহেব বলেন, "বাঙালিরা পূর্ব বা পশ্চিম বঙ্গের যেখানেই থাকুক না কেন, তারা অখণ্ড। তাদের মধ্যে সদ্ভাব এবং সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার, বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দিখণ্ডিত হয়েছে সত্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে তাদের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই।" হক সাহেবের এই মন্তব্যে কেন্দ্রিয় সরকার ভীষণ ক্ষুদ্ধ হন।

এর পরপরই এ কে ফজলুল হককে নজরবন্দী করা হয়। ৩০ মে কেন্দ্রিয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। ঐ দিন শেখ মুজিব করাচি থেকে ঢাকায় আসেন এবং পরদিন তাকে গ্রেফতার করা হয়। একই বছরের ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

চুয়ান্নর ৩ মার্চের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

১। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা হ্রাস করা হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা রহিত করা হইবে।

৩। পাট-ব্যবসার জাতীয়করণ। পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ-মন্ত্রীসভার আমলের পাট কেলেংকারীর তদন্ত করিয়া সংশিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পতি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪। সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন। সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন।

৫। পূর্ব বঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন। লবণ কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত।

৬। শিল্পী ও কারিগরী শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা ও তাহাদের পুর্নবসতি ব্যবস্থা।

৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষার ব্যবস্থা।

৮। পূর্ববঙ্গকে শিল্পায়িতকরণ। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিতকরণ।

৯। প্রাথমিক অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন। শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত পূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

১২। শাসনব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা। উচ্চ বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের বেতন হ্রাস ও নিু বেতনভোগীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

১৩। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ রিশওয়াত বন্ধ করা। এতদুদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুদ্দতের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ।

১৪। জন-নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনা বিচারে আটক সমস্ত বন্দীকে মুক্তিদান। সংবাদপত্র ও সভা সমিতি করিবার অধিকার ও অবাধ নিরংকুশকরণ।

১৫। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগকে পৃথক করণ।

১৬। বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা।

১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে শহিদানের পবিত্র স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান।

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করা ও উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌমকরণ এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসহ) পূর্ববঙ্গের হাতে আনয়ন। দেশরক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণকরণ। বর্তমানের আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয়মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করণ।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করণ এবং পরপর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

আওয়ামী লীগ গঠন

ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাতিল করার পর পূর্ব বাংলায় ৯২ক ধারা জারি করা হয়। শাসন ক্ষমতা গভর্ণরের হাতে নিয়ে জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্ণর পদে নিয়োগ করা হলো। গ্রেফতার করা হলো ভাসানী, ফজলুল হকসহ বহু নেতাকে। ইস্কান্দার মীর্জা ভাসানীকে গুলি করে হত্যা করার হুমকি দিলেন।

১৯৫৫ সালের ৩ জুন পূর্ব বাংলা থেকে গভর্ণর শাসন প্রত্যাহার করা হলো। ৫ জুন অনুষ্ঠিত হয় গণপরিষদ নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৭ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগের ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন না দিলে দলীয় সদস্যরা আইন সভা থেকে পদত্যাগ করবেন। আগস্ট মাসে গণ পরিষদে শেখ মুজিব বলেন, আমাদের দাবি এ অঞ্চলের নাম বাংলা হবে। এ বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গণপরিষদে তিনি গর্জে ওঠেন সাম্যের পক্ষে। সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি প্রশ্ন করেন, “গভর্নরকে

মাসে ছয় হাজার রুপী বেতন দেবেন আর আমাদের দেশের গরিব মানুষ অনাহারে মারা যাবে এরই নাম কি ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ?" তিনি বলেন, যে দেশে একজন পিয়নের বেতন মাসে পঞ্চাশ রুপী সে দেশে গভর্নরের এই বেতন কিভাবে মেনে নেয়া যায়? আজীবন তিনি এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিলে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয়। দলের নাম হয় আওয়ামী লীগ। প্রতিবাদে সালাম খান-এর নেতৃত্বে বেশকিছু সংখ্যক দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন নেতা ও এমএলএ' দল ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। ওদিকে আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষা করে কেন্দ্রিয় সরকার। কারণ, এ দাবিতে কৃষক প্রজা পার্টি সমর্থন দেয় নি।

১৯৫৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে শেখ মুজিব সরাসরি বলেন, "পূর্ববাংলায় জনসাধারণ কাফনের কাপড় পাচ্ছে না। লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হচ্ছে। জনগণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সংবিধানে এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে।" ৪ আগস্ট খাদ্যের দাবিতে ঢাকায় এক বিরাট মিছিল বের হয়। এ মিছিলের নেতৃত্ব দেন মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব। পুলিশ মিছিলে গুলিবর্ষণ করলে বেশ কজন হতাহত হয়। ৩০ আগস্ট আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিব শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের দায়িত্ব পান। ১১ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ১ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে শেখ মুজিব পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে বক্তৃতা দেন।

এ সময় মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লী যান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে দেখা করেন। দেখা করেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গেও। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করা নিয়ে সে সময় ডন পত্রিকায় শেখ মুজিবকে নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়। কারণ, শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতিকে সাক্ষাৎকালে এক বোতল সুন্দরবনের মধু দিয়েছিলেন। 'ডন' পত্রিকায় এই মধু নিয়ে সমালোচনা হয়েছে, মধু দিয়ে নাকি শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন।

তারপর শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের ১১ সদস্যের একটি দল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষে চীন সফর করেন। তারপর সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একই বছর শেখ মুজিব জাপান, অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসেবে রাশিয়াসহ কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ সফর করেন। এতে করে সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকার খাদ্য সংকটকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচীসহ গঠিত হয় ডি আই টি এবং সি ডি এ। স্থায়ী আমদানী রফতানী নিয়ন্ত্রণ অফিস স্থাপন করা হয়।

শহীদ মিনার ও বাংলা একাডেমীর গোড়াপত্তর এ সময়েই হয়। কিন্তু বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে তীব্র মতোবিরোধ সৃষ্টি হয়।

১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে পূর্ববঙ্গ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয় । এই অধিবেশনে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয় । মাওলানা ভাসানী এই অধিবেশনে শেষবারের মতো সভাপতিত্ব করেন । কারণ, বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তার মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করলে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন । পদত্যাগের পর ১৯৫৭ সালে ২৭ জুলাই তিনি পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অর্থাৎ ন্যাপ গঠন করেন ।

মাওলানা ভাসানীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন । আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে একই ব্যক্তির সাধারণ সম্পাদক এবং মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে নিয়ম না থাকায় ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনের পরপরই শেখ মুজিব মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে দলকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয়ে আত্মনিয়োগ করেন ।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে আওয়ামী লীগের সদস্যদের স্বীকৃতি আদায় করেন শেখ মুজিব ।

আইয়ূব খানের স্বৈরশাসন

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সারাদেশে সামরিক আইন জারী করেন ।
পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে আগেই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করেছেন । গভর্ণর ৩১ মার্চ পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের মন্ত্রী সভা ভেঙে দেন ।
পূর্ব বাংলা এবং সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতিতে নেমে আসে চরম সংকট । ২১ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে সদস্যদের চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়িতে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী মারাত্মকভাবে আহত হন এবং সেপ্টেম্বরে হাসপাতালে মারা যান ।
ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক সামরিক আইন জারীর পর শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়, মন্ত্রীসভা ও আইন পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয় । ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক জেনারেল আইয়ূব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন । সাবেক আইজি জাকির হোসেনকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর এবং মেজর জেনারেল ওমর খানকে জি ও সি নিয়োগ করা হয় ।
১১ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে । তার বিরুদ্ধে এক এক করে ছয়টি মিথ্যা মামলা দায়ের এবং ৬ বছরের জন্য রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হলো । শুরু হলো দেশব্যাপী জঙ্গী শাসন ।
আইয়ূব খানকে ফের প্রধানমন্ত্রী করে ২৪ অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জা ১২ জন সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠন করলেন ।
শপথ গ্রহণের কিছু সময় পরেই আইয়ূবের দূত ইস্কান্দার মীর্জার কাছে গেলেন ।
মীর্জাকে ফাঁদে আটকালেন সচতুর আইয়ূব । রাত্রের অন্ধকারে সপরিবারে ইস্কান্দার মীর্জাকে পাকিস্তানের মাটি থেকে চিরবিদায় নিতে হলো । আইয়ূব খান নিজেকে প্রেসিডেন্ট এবং সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা দিলেন । সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সভা- সমিতি নিষিদ্ধ করলেন ।
এদিকে দীর্ঘ ১৪ মাস কারাভোগের পর ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শেখ মুজিব মুক্তি পান । কিন্তু একদিকে সামরিক আইন জারী অন্যদিকে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে ।
১৯৬০ সালের ৩ জানুয়ারি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে দলীয় কর্মীদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন শেখ মুজিব । এ সময় সরকার তাঁর গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখার আদেশ দেন ।

১৯৬১ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেরে বাংলা ফজলুল হক মারা যান। ১৯৬২ সালের ২৫ জানুয়ারি আতাউর রহমান খানের বাসভবনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আতাউর রহমান প্রমূখ এক গোপন বৈঠক করেন। বৈঠকে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দের দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি আইয়ূব সরকার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এবং ৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। আরো গ্রেফতার করেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও কোরবান আলী প্রমূখকে। এসব নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৬ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে গণ আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ূব খান নতুন শাসনতন্ত্র জারী করেন। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির এই নতুন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদ করে। ২৭ এপ্রিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন শুরু হয়। ৮ জুন আইয়ূব সরকার সামনিক আইন তুলে নেন। ১৩ জুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

১৮ জুন শেখ মুজিব মুক্তি পান। ২৪ জুন তিনি ৮ জন বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি 'নয় নেতার বিবৃতি' নামে পরিচিত। ৩ জুলাই শেখ মুজিব এক বিশাল জনসভায় আইয়ূব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ১৯ জুলাই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচী জেল থেকে মুক্তি পান।

১৯৬২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু লাহোর যান। এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় মোর্চা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' গঠিত হয়। ২৮ অক্টোবর তারিখে মুসলিম লীগের মোনায়েম খানকে গভর্ণর নিযুক্ত করলে পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর নেমে আসে শোষণ নিপীড়ন। শেখ মুজিব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সারা পূর্ববাংলা সফর করে আইয়ূব মোনায়েম শাসক চক্রের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে তুলেন।

১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মারা যান।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মারা যাওয়ার পর পূর্ব বাংলায় এক বিরাট রাজনৈতিক শূন্যতা দেখ দেয়। শেখ মুজিবও অনেকটা ভেঙে পড়েন। একসময় সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুশোক কাটিয়ে ওঠেন শেখ মুজিব। নতুন উদ্যমে আওয়ামী লীগকে পুনরায় উজ্জিবত করার অভিপ্রায়ে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

এই থেকে শুরু হলো রাজনীতির আরেক অধ্যায়। শেখ মুজিবের নিজস্ব অধ্যায়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১৯৬৪ সাল। কাশ্মিরের হযরত বাল মসজিদে রক্ষিত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র কেশ চুরি যাওয়ার প্রতিবাদে কাশ্মিরে হরতাল এবং এই হরতালের রেশ ধরে পূর্ব বাংলায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আইয়ূব-মোনায়েম চক্র গণ-আন্দোলনকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে কাজে লাগায়। তাদের কূটকৌশল হিসেবে ঢাকা এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে পেশাদার অবাঙালি সন্ত্রাসীদের সাহায্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই এই দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। পরবর্তীতে এই দাঙ্গা বাঙালি-অবাঙালির দাঙ্গায় রূপ পায়। শেখ মুজিব অনুধাবন করলেন এই দাঙ্গার ভয়াবহতা। তিনি শীঘ্র দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করলেন। সেইসাথে ১৬ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক একটি ইস্তেহার প্রচার করেন। এই ইস্তেহার প্রচারের অভিযোগে সরকার শেখ মুজিব এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে গ্রেফতার করে এবং পরে মুক্তি দেয়।

১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

৬ মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সভাপতি এবং শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১১ মার্চ শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

এদিকে ছাত্র আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ২৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘৃণ্য মোনায়েম খাঁনের কাছ থেকে সনদপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় ছাত্ররা। শেখ মুজিব ছাত্রদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। মোনায়েম খাঁন প্রতিশোধ হিসেবে ছাত্রদের উপর হয়রানি শুরু করে দেয়। এ সময় ঢাকা হলের ভিপি ছাত্রলীগ নেতা আসমত আলী সিকদার এবং ছাত্রলীগ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনির এম. এ ডিগ্রী কেড়ে নেয়া হয়। শুধু তাই নয় তাদের দীর্ঘদিন কারাগারে অন্তরীণ রাখে।

আইয়ূব খান নির্বাচনের ঘোষণা দেন। শেখ মুজিব আইয়ূব বিরোধী কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে নেতৃত্ব দেন এবং মিস ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থনে পূর্ব বাংলার অসংখ্য নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা দেন। আইয়ূব খান বুঝতে পারেন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে জনসমর্থন ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে চলে যাচ্ছে। দিশেহারা হয়ে পড়েন আইয়ূব খান। তাই নির্বাচনের ১৪ দিন আগে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তিনি জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি। নির্বাচনে আইয়ুব খান ভোটারদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। এতে তার মৌলিক ৮০ হাজার ভোটারের ৬৩ ভাগ ভোট পেয়ে আইয়ুব খান মুসলিম লীগের পক্ষে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
একই প্রক্রিয়ায় ২১ মার্চ এর জাতীয় পরিষদ ও ৫ মে'র প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বিরোধী দলকে সুপরিকল্পিত ভাবে পরাজিত করে।
৩ এপ্রিল শেখ মুজিব মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, আওয়ামী লীগ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

ঐতিহাসিক ছয় দফা

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাশ্মিরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল ১৭ দিন। জাতিসংঘ ও বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসময় শেখ মুজিব ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে অংশ নেন নি।
১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে উভয় দেশ শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ মাসেই আইয়ুব সরকারের দমননীতি পুনরায় শুরু হয়। সরকারের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বক্তব্য এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। এই অভিযোগে তাকে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতি আর. টি. তালুকদার তাঁকে জামিনে মুক্তি দেন। মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব পুনরায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকেন।
১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে আইয়ুব সরকার সমগ্র পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলন ডাকেন। শেখ মুজিব অন্যান্যদের সঙ্গে এই সম্মেলনে যোগ দেন। ৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব সম্মেলনে ছয় দফা দাবি পেশ করলেন।

ছয় দফা

১। ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা-করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

২। ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার, এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় ষ্টেট সমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

৩। এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে ঃ

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময় যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না; আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

৪। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এই ভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

৫। এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছেঃ

(ক) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাবে রাখিতে হইবে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

(গ) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(ঘ) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

(ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্য সমন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী- রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

৬। এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ হইয়াছে।

ছয়দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। এই ছয়দফার কর্মসূচী দাবির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানের প্রতিক্রিয়া হলো বল প্রয়োগে এটি দমন করা। ছয় দফা দাবিকে আইয়ূব খান বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনা বলে ঘোষণা করে বললেন, “অস্ত্রের ভাষায় ছয় দফার জবাব দেওয়া হবে।”

এদিকে লাহোর থেকে ফিরেই শেখ মুজিব ব্যাপকভাবে সমগ্র পূর্ববাংলা সফর করেন। উদ্দেশ্য, ছয় দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। সফরকালে তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিব এ সময় তিন মাসে প্রায় ৮ বার গ্রেফতার হন।

১৯৬৬ সালের ১৮ এপ্রিল শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে ৯ মে তাঁর বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আইনে (ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস) আটকাদেশ জারী করা হয়। ছয় দফার সমর্থনে এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ৭ জুন বিক্ষোভ দিবসের ডাক দেওয়া হয়। আইয়ূব খান জনতার এই আন্দোলনকে তার ঘোষণা অনুযায়ী বল প্রয়োগে দমন করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানো হলো। নিহত হলেন মনু মিয়াসহ বেশ কয়েকজন। গ্রেফতার করা হলো অনেককে।

আইয়ূব সরকারের দমন-পীড়নে আন্দোলন কিছুটা থমকে গেল। সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে হাইকোর্টে একাধিক রীট পিটিশন দায়ের করে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আদালতে তোলা হলো। পরিস্থিতি হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠলো ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে। তার আগে দীর্ঘ ১১ মাস কারাভোগ করে শেখ মুজিব মুক্তি পান।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৭ সালে নৌ-বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স সংগঠিত হয়। তারা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পরামর্শ করে। কিন্তু এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। আইয়ুব সরকার কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রধান আসামী করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু করে। পরে ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামী করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে আইয়ূব সরকার। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আসামীরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছেন। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় আসামীরা ভারতের সঙ্গে গোপনে অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছেন।

আইয়ূব সরকার মনে করেছিল জনগণ ভাববে ভারতের সঙ্গে আসামীদের যোগসাজস রয়েছে, তাই এই মামলায় জনগণ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে আসা হয়। এ সময় শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ শুরু হয়। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হতে থাকে সারা বাংলা–'জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব'।

১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবের মামলা শুরু হয়। এই মামলা শুরু হওয়ায় আগের সময়গুলোয় গোটা মামলাটি কঠিন গোপনীয়তায় রাখা হয়; এমন কি অভিযুক্তরা কে কোথায় আছেন, সে ব্যাপারেও কোনো তথ্য জানানো হয় নি। পরে জানা গেছে, কারাগার থেকে অভিযুক্তদের সরিয়ে সামরিক হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

বিচার শুরু হওয়ার পর আসামীদের পক্ষে প্রবাসী বাঙালিদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ব্রিটিশ ব্যারিস্টার টমাস উইলিয়ামস কিউ সি, এমপি ঢাকায় আসেন।

সরকারি পক্ষের উকিল ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের। আসামীদের পক্ষে যেহেতু ইতিমধ্যে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আইনজীবীদের একটি পূর্ণাঙ্গ দল রয়েছে, তাই ঠিক হলো টমাস উইলিয়ামস বিচারে দু'একদিন জেরা পরিচালনা করবেন এবং হাইকোর্টে একটি রীট পিটিশন দায়েরের জন্যে কাজ করবেন। রীট পিটিশন তৈরির সময় ডঃ কামাল হোসেন যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়াও টমাস উইলিয়াম এর সঙ্গে অন্যান্য যে সব আইনজীবী কাজ করেছেন তারা হলেন, ডঃ আলীম আল রাজী, আতাউর রহমান খান ও জহির উদ্দীন প্রমূখ।

এই মামলায় প্রায় ১৫০ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে। মামলায় অভিযুক্তদের উপর সামরিক বাহিনী যে সব অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে তা সাক্ষ্য গ্রহণের সময় প্রকাশ হয়ে পড়ে। মামলার অন্যতম আসামী লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন নির্যাতনের ফলে তার যে দাঁতটি পড়ে যায় তা কোর্টে উপস্থিত করেন।

মামলার অগ্রগতি এবং প্রতিদিনের কাজের আক্ষরিক বিবরণাদি দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ফলাও করে প্রকাশিত হওয়ায় মামলাটির ব্যাপারে জনমনে প্রচণ্ড কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। বাঙালি জনগণের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নির্যাতিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি জনমনে প্রগাঢ় সহানুভূতি অর্জন করে।

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যে মনোভাব নিয়ে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে প্রহসনের বিচার শুরু করেছিলেন, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বরং উল্টো বাঙালির ক্ষোভ এবং ছয় দফার দাবিসমূহ ব্যাপক প্রচার লাভ করে। আইয়ুব সরকারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগ দমন নীতি প্রতিরোধ দিবস পালন করে এবং প্রদেশব্যাপী স্বতস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়।

১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি সম্মিলিত বিরোধী দল 'ডাক' অর্থাৎ 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন কমিটি' গঠন করে। 'ডাক' গঠনের দলিলে স্বাক্ষর করেন পশ্চিম পাকিস্তানের নওয়াব জাদা নসরুল্লাহ খান, পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

আন্দোলনের পরিস্থিতিকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ নিজেদের সংগঠিত করে। গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এগারো দফা দাবি নামা প্রস্তত করলো। এই এগারো দফা ছয় দফার সম্প্রসারিত পূর্ণ রূপ। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ফেটে পড়ল প্রচণ্ড বিক্ষোভে। বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমান, রুস্তম ও মকবুলসহ কয়েকজন শহীদ হন। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ফেটে পড়ল ছাত্রসমাজসহ সর্বস্তরের জনগণ। সৃষ্টি হলো গণঅভ্যুত্থান।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা

১। (ক) স্বচ্ছল কলেজগুলিকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ইতিমধ্যে যেসব কলেজ প্রাদেশিকীকরণ করা হইয়াছে সেগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চ ক্লাসে ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে হবে। কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি ছাত্রদের দাবী মানিতে হইবে, ছাত্র বেতন কমাইতে হইবে। নারী শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার করিয়া শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(খ) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে।

(গ) শাসক গোষ্ঠির শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' ও 'হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট' বাতিল করিতে হইবে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে :

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেল শাসনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা, এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রের এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভেনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সাথে সাথে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর পরীক্ষামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে। এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনির সদর দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫। ব্যাংক, বীমা, ইনস্যুরেন্স ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহসিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহসিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মন প্রতি ৪০.০০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারপ্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

২৮ জানুয়ারি শেখ মুজিব বিচার কক্ষে পাঠ করলেন ঐতিহাসিক লিখিত জবানবন্দি। নিচে তাঁর সম্পূর্ণ জবানবন্দি তুলে দেয়া হলো :

"স্বাধীনতাপূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রীয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে; এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমার নেতা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার প্রথানুসারে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমার উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভ কালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারি করা হয়। যেমন– ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে

এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মতো আমার পিছু লাগিয়া থাকিত। অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয়মাস বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধীদলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধীদল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারী কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহবান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্ব শান্তিতে আস্থাবান – আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত। ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান–ছয়দফা কর্মসূচী উপস্থিত করি। ছয় দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান–উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা হইয়াছে।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসন যন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি

জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুকে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তবর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন। কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, আটটায় পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পর দিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন। কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা-দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারী পরোয়ানা পাহারাধীন মোমেনশাহী হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেইরাত্রে আমাকে পুলিশ মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহী মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃতি হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারী প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে– সম্ভবতঃ আটই মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ' প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহম্মদ চৌধুরীসহ বহু অন্যান্য। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম.এন.এ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যান সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রিয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম. এন. এ. জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব

সুলতান আহম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আব্দুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্র নেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষার বিধি ৩২ ধারা (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র পুর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহিদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার্স অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালে ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যাক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব মোনেম খান প্রায়শইঃ তাঁহার লোকজন এবং সরকারী কর্মচারী সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতদিন তিনি গদিতে আসিন থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখিন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না, বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগ বিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাস কাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮-ই জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আব্দুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে আমার অন্যতম কৌসুলী নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুরীর সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষিত করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির, এল এস সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, কামালউদ্দিন আহম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান– এই তিনজন সি, এস, পি, অফিসারদের আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারি কার্য সম্পাদনকালে তাঁহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। কোনোদিন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে কোনো সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজুদ্দীনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনোদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দিই নাই। আমি কখনও ডাঃ সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাঁহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিন জন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কমকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী; এম. এন. এ, ও এম. পি. এ। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশজন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ; প্রাক্তন এম. এন. এ. এম. পি. এ. ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাঁহাদের কাহারও নিকট কোনো প্রকার সাহয্যের কথা উলেখ করি নাই। ইহা সম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল, এম, এফ ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোনো সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহম্মদ চৌধুরীর বিরোধীতা করিবার জন্য ডাঃ সাঈদুর রহমানের গৃহে তদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল– দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক, রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম –ছয় দফা কর্মসূচীতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ

স্বীকার করিয়াছে– তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে–এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে। একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জনাইতে চাই যে, সংশিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।"

১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ূব খান তাঁর 'মাস পয়লা' বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন, তিনি বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানাবেন। যা 'গোলটেবিল বৈঠক' নামে অভিহিত। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক)-এর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানকে সম্বোধন করে এক চিঠিতে আইয়ূব খান ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়াল পিন্ডিতে বিরোধী নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় বসতে বললেন। এই পদক্ষেপ আইয়ূব শাহীর দুর্বলতা আর গণআন্দোলনের শক্তি প্রকাশ পেল।

আলোচনায় বসতে শর্ত দিলো 'ডাক'– সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। যেখানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্ন জড়িত।

কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতিকে অবাক করে দিয়ে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে আইয়ূব- মোনায়েম চক্র নৃশংসভাবে হত্যা করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে। এই সময় ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুজ্জোহাকে গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তান বাহিনী। এই মৃত্যু আর শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে উত্তেজিত ছাত্র-জনতা কার্ফু ভঙ্গ করে সেদিন রাতেই পাক বাহিনীর সঙ্গে বাধ্য হয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেন এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেন।

মুক্তির পর শেখ মুজিব এ জাতির মহানায়ক এবং পূর্ব বাংলার গণমানুষের আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ঢাকায় একটি জনসমাবেশে ভাষণ দিয়ে জনগণের রায় নিয়েই গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্যে রাওয়াল পিন্ডি যাওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

সে মোতাবেক ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র জনতার এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দশ লাখেরও বেশি এই সমাবেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ কারামুক্ত শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলেন। জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার জন্য জনগণের অনুমোদন নিলেন। তিনি বললেন, গোল টেবিল বৈঠকে তিনি বাঙালি জনগণের দাবি-দাওয়া তুলে ধরবেন। ওই সব যদি মেনে নেয়া না হয় তাহলে তিনি ফিরে এসে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন–কিছুতেই আপোষ করবেন না। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে মাওলানা ভাসানী বিরোধীতা করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। ভাসানী বললেন পাকিস্তানীদের এই গোলটেবিল বৈঠক প্রহসন মাত্র। তারা কিছুতেই দাবি মানবে না। কার্যত ঘটলও তাই। ব্যর্থ হলো গোলটেবিল বৈঠক। কারণ শেখ মুজিব তার ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অটল। ১৪ মার্চ শেখ মুজিব ফিরে এলেন ঢাকায়।

সংবাদ সম্মেলন করলেন বঙ্গবন্ধু। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'ডাক' থেকে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাহার এবং গণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। কারণ 'ডাক' ছয় দফার মূল দাবি স্বায়ত্তশাসনের সমর্থন করছে না। এই ঘোষণার পরপরই ডাক-এর বিলুপ্তি ঘোষিত হলো।

সারাদেশব্যাপী আইয়ূব খানের প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হলো। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করল। গভর্ণর মোনায়েম খান পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গেলেন। ২১ মার্চ তার স্থলাভিষিক্ত হন ডঃ এ এন হুদা। বাধ্য হয়ে আইয়ূব খানও ক্ষমতা ছাড়লেন। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসেই ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল, জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত ও সামরিক আইন জারি করলেন।

সত্তর এর নির্বাচন

২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন যান। এদিকে ইয়াহিয়া খান উপলব্ধি করলেন, জনগণের বিক্ষোভের মুখে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে নগ্ন সামরিক শাসন চালানো যাবে না। ফলে দেশের উভয় অংশের চাপ মোকাবিলা ও নিজের শাসনকে বৈধতা দিতে নতুন ভিত্তি খুঁজতে শুরু করলেন। যার ফলে ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ঘোষণা করলেন, একটি গণপরিষদ গঠনের উদ্দেশে তিনি একটি আইনগত রূপরেখা ঘোষণা করবেন। তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের নীতি মেনে নেয়ার কথা বললেন। এর ফলে পরিষদে ৩১৩ টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান পাবে ১৬৯টি, পশ্চিম পাকিস্তান পাবে ১৪৪টি আসন। গণপরিষদে নির্বাচিত সদস্যরা চার মাসের মধ্যে প্রণয়ন করবেন নতুন শাসনতন্ত্র। সেইসাথে পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল করেন। ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

এ বছরের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন বাংলাদেশ ।

১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন । আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে প্রথম বারের মতো 'জয়বাংলা' শ্লোগান দিয়ে ভাষণ শেষ করেন । ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তার প্রথম নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন । এই জনসভায় তিনি বলেন, "ছয় দফা বাস্তাবায়ন ছাড়া আর কোনো পথ নেই । 'ইসলাম বিপন্ন'–কথাটা যারা বলছেন তাঁদের ধাপ্পাবাজ রাজনীতিবিদ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না ।" ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' পছন্দ করেন । ২৮ অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশে বেতার-টিভির ভাষণে ছয় দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান ।

পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ৫ অক্টোবর নির্বাচন হলো না । আগষ্ট মাসের দিকে বন্যা দেখা দেওয়ায় নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন দলের নেতাদের অজুহাত সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হলো । নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষিত হলো ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ ।

কিন্তু ১১ নভেম্বর দিবাগত রাতে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে মহাপ্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে প্রায় ১০ লাখ লোক নিশ্চিহ্ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমাহীন ঔদাসিন্যের দরুন পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো । ধ্বংস ও মৃত্যুর ব্যাপকতা সারা বিশ্বের সংবাদ শিরোণামে পরিনত করে । সেই সাথে ইয়াহিয়া ও তার কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসিন্য দেশে–বিদেশে সমালোচনার ঝড় তুলে । ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই চীন থেকে ফেরার সময় ইয়াহিয়া ঢাকায় যাত্রা বিরতি করলেন, কিন্তু এখানে অবস্থান করলেন না । সরকার পরিচালিত ত্রাণ তৎপরতা ছিলো মন্থর ও অপর্যাপ্ত । এই ঘটনাটিও শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় যোগ্যতা প্রমাণের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণের বিক্ষুব্ধ অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ এনে দিলো ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাওলানা ভাসানী ছুটে গেলেন দুর্গত এলাকায় ।

এদিকে বিভিন্ন দল আবারো নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি তুললো । আওয়ামী লীগ এই দাবির প্রতিবাদ জানালো । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচন দেয়ার চেষ্টাকে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করলেন এবং জনগণ ঐ চক্রান্ত প্রতিহত করবে বলে হুশিয়ারি দিলেন । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বললেন, "দশ লাখেরও বেশি মানুষের জীবনহানি ঘটেছে, প্রয়োজন হলে আরো দশলাখ বাঙালি জীবন দেবে, কিন্তু চক্রান্তকারীদের প্রতিহত করে জনগণ এবার ক্ষমতায় যাবেই–যাতে নিজেদের ভাগ্য তারা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।" পরিস্থিতি টের পেলেন ইয়াহিয়া খান । নির্বাচন পেছানোর চিন্তা বাদ দিলেন । শুধুমাত্র ঘূর্নিদুগর্ত এলাকার ১৭টি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখা হলো । ৭ ডিসেম্বর নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অন্যান্য স্থানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ।

৩১৩টি আসনের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হলো । নির্বাচনের এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ফলাফল ছিল শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও ছয়দফার পক্ষে জনগণের সুস্পষ্ট রায় । ফলে ইয়াহিয়ার গোটা কৌশল মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো ।

নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪৪টি আসনের মধ্যে ভুট্টোর পিপি ৮৩ টি আসনে জয়ী হলো ।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি। রমনা রেসকোর্স ময়দানের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধিদের ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। ৫ জানুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বাধিক আসন লাভকারী পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো কেন্দ্রিয় কোয়ালিশন সরকার গঠনে তার সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। ১৬ জানুয়ারি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে জাতীয় পরিষদের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। উপনেতা নির্বাচিত হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

১৯৭১ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলেন। এই বৈঠকে ইয়াহিয়া নতুন করে ছয়দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা চাইলেন।

শেখ মুজিব শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে ছয় দফার ব্যাখ্যা করলেন। বৈঠক শেষে ইয়াহিয়া লারকানা চলে গেলেন। ফের ঢাকায় এলেন ২৭ জানুয়ারি। কয়েক দফা আলোচনা হলো। আলোচনা হলো শেখ মুজিব ও ভূট্টোর মধ্যে; কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হল।

১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহবান করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভূট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ট দুই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে ভূট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করেন। বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, "ভূট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ট দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।"

১ মার্চ এক বেতার ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের গণপরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করেন। ইয়াহিয়া এই ঘোষণা শোনামাত্র পূর্ব বাংলার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ

ইয়াহিয়ার বেতার ঘোষণার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন। ২ মার্চ থেকে পরবর্তী ছয় দিনের আন্দোলন কর্মসূচীও ঘোষণা করলেন এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বাধীনতার পতাকা বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলো। কর্মসূচীর মধ্যে ২ মার্চ ঢাকায় হরতাল, ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা। সে জনসভায় নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেবেন। ২ মার্চ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, "গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে কোনো ধরনের সহযোগীতা না করা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে কোনো ষড়যন্ত্র সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা সরকারি কর্মচারীসহ প্রতিটি পেশার প্রত্যেক বাঙালির পবিত্র দায়িত্ব। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ক্ষমতার একমাত্র বৈধ উৎস। আশা করা হচ্ছে, সকল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সচেতন থাকবে।"

৩ মার্চ ছাত্রদের আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিব দাবি করলেন, সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ৭ মার্চ ১৯৭১। এদিন দুপুর থেকেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জমায়েত হয়েছিল লাখ লাখ মানুষ। এদিন বিশাল জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে শেখ মুজিব সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও জনতাকে এমন কতগুলো নির্দেশ দিলেন যে সারা পূর্ব বাংলার মানুষ তাঁর নির্দেশ মেনে চলল।

৭ মার্চের ভাষণ

"ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষ নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নি। ১৯৫৮ সালে আইয়ূব খান মার্শাল-ল জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সাল ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ূব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভূট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসব। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো–এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম–আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানে মেম্বাররা যদি এখানে আসেন তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে

ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। কি পেলাম আমরা? জামার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু–আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন বিচার করুণ। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের রাউণ্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখ সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আর টি.সি.-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম সামরিক আইন মার্শাল-ল' প্রত্যাহার করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে–শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্ণমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি

আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছ, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল – কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় – হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ দেয়া নেয়া চালাবেন।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।”

৭ মার্চের ভাষণের পরপরই পূর্ব বাংলার জনগণ ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সরাসরি যুদ্ধের ঘোষণা না হলেও পরোক্ষভাবে এই ভাষণই ছিল মুক্তিযুদ্ধের শুরু। স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক।

৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে যত বিশ্লেষণ করা যাবে ততই এর ভেতরের রাজনৈতিক সুগন্ধ বেরুবে। একজন নেতার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা স্পষ্ট ধরা পড়ে এই ভাষণে। কী নেই এই ভাষণে? রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা কী চমৎকার ও কায়দা করে বলা হয়েছে!

রফিকুল ইমলাম বীর উত্তম তাঁর ‘একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে’ বইতেও একই কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, “রাজনীতিক ছিলেন শেখ মুজিব। সুতরাং উত্তেজিত লোকদের পক্ষে যা সম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তাই তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে ধীরস্থির ভাবে। শেখ মুজিব সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না করলেও জনগণকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। বস্তুতঃ এটা ছিল যুদ্ধ ঘোষণার সামিল।”

ডঃ আলাউদ্দিন আল- আজাদ তাঁর ‘ফেরারী ডায়েরী’ বইতে লিখেছেন, “মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দলিল, লিংকনের ভাষণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এবং ভাষণ হিসেবেও এমনি অনবদ্য যে তা নিঃসন্দেহে বিশ্বের দশটি শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণের অন্যতম। এ ভাষণ শুধু যেন ভাষণ নয়, এক বীজমন্ত্র যা কোটি কোটি মানুষকে শুধু উদ্দীপ্ত করে নি, এক কঠিন সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করেছে। যেন কোনো ব্যক্তি নয়, একটা আলোড়িত জাতির মর্মমূল থেকে এই ভাষণের উৎপত্তি। প্রাকৃতিক ঘটনার মতো বাংলা ভাষায় এই ভাষণ প্রকাশ পেয়েছে সেজন্য আমি গর্ববোধ করি। অনেকেই ভেবেছিলেন, সাতই মার্চের বিপুল জনসভায় মজিব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। তিনি যে সরাসরি তা করলেন না, তা বিস্ময়কর। এবং এটাও তার প্রতিভা। তাঁর বক্তৃতার শেষাংশ প্রকাণ্ড একটা ‘যদি’র ওপর দাঁড়িয়ে আছে। জিনিসটা ঠিক ওস্তাদের মারের মতো। রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার আহবান। অথচ বক্তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলা আইনগত অসম্ভব। যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে সেটা ভুল নয়; গণতন্ত্রের নিজস্ব দুর্বলতা। জনতাকে হুকুম দিলে মুজিব সেদিন রাজধানী দখল করতে পারতেন। কিন্তু সে স্বাধীনতা রক্ষা করা কি সম্ভব হতো? গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তর আরেক ইতিহাসের নতুন প্রস্ফুটন।”

শিল্পী হাশেম খান ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে লিখতে গিয়ে বলেছেন, “বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং একটি জাতির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য নির্যাতিত, বঞ্চিত ও নিরীহ মানুষকে সাহস ও শক্তি যুগিয়ে উদ্বুদ্ধ করার মন্ত্র যেন। ভাষণের প্রতিটি বাক্য যেন এক একটি শক্তি সেল, সাহস ও প্রেরণার কবিতা।”

শেখ মুজিবের ঘোষিত সকল নির্দেশ দেশবাসি পালন করতে লাগল। “নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করা হলো। ‘কর বন্দের’ আন্দোলন বহাল রইলো। জরুরী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখার জন্যে ৭ ও ৯ মার্চ আরো কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করা হলো। নির্দেশ হলো রেলওয়ে ও বন্দরসমূহ চালু থাকবে, তবে জনগণের ওপর নির্যাতন চালানোর প্রস্তুতি হিসেবে সৈন্য চলাচল ও মোতায়েনের জন্যে রেলওয়ে ও বন্দরগুলোকে ব্যবহারের চেষ্টা করা হলে রেল ও বন্দর শ্রমিকরা সহযোগীতা করবে না।”

এ ছাড়া জরুরি অর্থনৈতিক তৎপরতা নিশ্চিত করতে আরো কিছু নির্দেশ দেওয়া হলো। ১১ মার্চ শেখ মুজিব জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উ থান্ট-এর নিকট বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে দৃষ্টি দেয়ার জন্যে এক তারবার্তা পাঠান। সেই তারবার্তায় তিনি অভিযোগ করেন যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি এনে বাংলাদেশে মজুদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৫ মার্চ। ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন। ১৬ মার্চ ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় বৈঠক চললো। বৈঠক শেষে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। ১৭ মার্চ শেখ মুজিব-ইয়াহিয়া আবার বৈঠক করলেন। এভাবে ধাপে ধাপে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বৈঠক চললো। এই বৈঠকে মূলত যে বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত হলো, তা হলো –

ক) সামরিক শাসন প্রত্যাহার
খ) নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং
গ) পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে ছয় দফার কর্মসূচীর ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান বোঝালেন, তার পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। শেখ মুজিব বললেন যে সেটা একান্ত তার (ইয়াহিয়ার) ব্যাপার এবং তিনি ইচ্ছে করলে তা করতে পারেন। ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথা জানালেন।
শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। বৈঠক ব্যর্থ হলো। তার আগে ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ২৫ মার্চ কোনো মীমাংসা ছাড়াই ইয়াহিয়া খান গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান যাওয়ার পরপরই খবর পেয়ে যান শেখ মুজিব। বাঙালিদের দাবিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে সেনাবাহিনী নামার আশংকা করলেন অনেকে। শেখ মুজিবকেও অবহিত করলেন এ ব্যাপারটি।
নিকটজনেরা আরো অবহিত করলেন, পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর আক্রোশ তখন শেখ মুজিবের প্রতি। তাই তাঁর উচিত কোথাও সরে যাওয়া। কিন্তু শেখ মুজিব সরলেন না। রাত সাড়ে আটটার দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল সেনাবাহিনী নামবে। রাত সাড়ে দশটার দিকে সেনাবহিনী নেমেও পড়ে। শুরু হয় তাদের পূর্ব পরিকল্পিত আঘাত। ঢাকার সাধারণ মানুষের উপর সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক অভিযান শুরু হলো। পাক বাহিনী হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজারবাগ পুলিশ লাইন, হাজারীবাগ ইপিআর ক্যাম্প, আর হলগুলোসহ ঢাকা ভার্সিটি এলাকায়। ট্যাংক কামান আর মেশিন গানের গুলির শব্দে সারা ঢাকা শহর প্রকম্পিত হতে লাগল।
ঝাঁক ঝাঁক বুলেট আর গোলার আঘাতে মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকারে তলিয়ে গেল অসংখ্য নরনারী, ছাত্র শিক্ষক ছিন্নমূল মানুষ। সে রাতেই অর্থাৎ ২৫ মার্চের রাত বারটার দিকে শেখ মুজিব ওয়্যারলেসে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং এই ঘোষণাটি চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
ঘোষণাটি ২৬ মার্চ দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নান পাঠ করেন। আবদুল হান্নান পঠিত স্বাধীনতা ঘোষণার বাণীটি হলো : The Pakistan Army has attacked police lines at Rajarbag and East Pakistan Rifles Headquarters at Pilkhana at midnight. Gather strength to resist and prepare for a war of Independence. - page 24, Massacre by Robert Payne, The Macmillan Company New York.

স্বাধীনতার ঘোষণা

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা, ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।
সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোষ নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ ১৯৭১

declaration of independence

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent.
I call upon the people of Bangladesh, wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

Sheikh Mujibur Rahman
26 March 1971
পরদিন বেতার কর্মীরা কালুর ঘাট ট্রান্সমিশন ভবন থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান' প্রচার শুরু করে। সেখান থেকেই ২৭ মার্চ তদানীন্তন মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণাটি পাঠ করেন।

তার আগে ২৫ মার্চ রাত একটার দিকে পাক বাহিনী শেখ মুজিবকে ধানমন্ডি ৩২ নং রোড বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাসে পরে করাচি এবং তারপর মিয়ানয়ালী (পাঞ্জাব) জেলখানায় আটক রাখা হয়। ২৫ মার্চ রাতেই শেখ মুজিবের প্রধান প্রধান সহযোগীরা যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে পরিকল্পনানুযায়ী ঢাকা ত্যাগ করেন। ৩০ এপ্রিল ১৯৭১-এ গঠিত হয় মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুজিবনগর সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। তাই উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করলেন। প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। অস্থায়ী সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। বাংলার দামাল ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেশকে শত্রুমুক্ত করার দীপ্ত শপথ নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করল। এরই মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানে শেখ মুজিবের গোপন বিচার শুরু হয়। বিশ্ব জনমতের চাপে জনাব এ কে ব্রোহীকে শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু বিচারে হুকুম দেওয়া হলো শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড হবে। এই আদেশের পরপরই যুদ্ধে পাকিস্তানীদের পরাজয়ের আভাস পাওয়া যায়। শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তার জন্যে পাকিস্তান সরকারকে চাপ দেয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। শেষ হলো রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল। বিশ্ব দরবারে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াল।

শেখ মুজিব তখনো পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। সারাবিশ্ব পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করল শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যে। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইয়াহিয়া খান পদত্যাগ করলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট হলেন।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২। ভুট্টো সাহেব শেখ মুজিবকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি পেয়েই শেখ মুজিব লন্ডন গেলেন।

১০ জানুয়ারি লন্ডন থেকে ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর বিমানে দিল্লি এসে পৌঁছেন। দিল্লির প্যারেড গ্রাউন্ডে শেখ মুজিব এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দেন। সেদিনই দুপুর ১ টা ৪১ মিনিটে শেখ মুজিব দেশে ফেরেন। একই দিন রাতে তিনি প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দেশ গঠন

দেশে ফিরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি যুদ্ধ বিধস্ত বাংলাদেশকে গড়ার লক্ষ্যে সহযোগীদের নিয়ে বিপুল উদ্যোমে কার্যক্রম শুরু করেন।

১২ জানুয়ারি ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হলো সংসদীয় গণতন্ত্র। আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি মনোনীত হলেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭০-এর নির্বাচিত এম এন এ এবং এমপিদের সমন্বয়ে গঠন করলেন গণ-পরিষদ। ১০ এপ্রিল ১৯৭২ সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গণ-পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। খসড়া সংবিধান গণ-পরিষদ অনুমোদন করে ৪ নভেম্বর।

সেই সাথে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেন মুক্তিযুদ্ধে সম্পদহারা কৃষকদের বাঁচানোর জন্যে ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সুদসহ সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করেন এবং ব্যাংক, বীমা, পাটশিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্পসহ সকল ভারী শিল্প জাতীয়করণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর অত্যাচারে যে এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পুনর্বাসন করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মুজিব সরকার। এ ছাড়া পাকিস্তানের আটকেপড়া বাঙালি বেসামরিক ও সামরিক লোকজন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন।

দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করান। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ত্র উদ্ধার করান।

যুদ্ধের সময় যেসব রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, ব্রিজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেগুলো মেরামত করে যাতায়াত ব্যবস্থা স্বাভাবিক করেন। বিমানবন্দরের বিধ্বস্ত রানওয়ে মেরামত ও বঙ্গোপসাগরে মাইন অপসারণ ও ডুবে যাওয়া জাহাজ উদ্ধার করে বন্দর সচল করার ব্যবস্থা করেন।

শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ে কালাকানুন বাতিল করে নতুন আইন জারি করেন। শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্যে ডঃ কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে এক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। তিনি গঠন করেন পরিকল্পনা কমিশন। এই পরিকল্পনা কমিশনের প্রদত্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অনন্য দলিল। পরাধীনতার আমলের প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। বাংলাদেশের মুদ্রা চালু করেন।

শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্রুত পরিচিতি লাভ করে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ শেখ মুজিবের সুদৃঢ় পররাষ্ট্রনীতির ফসল। শেখ মুজিব জাতিসংঘে প্রথম বাংলাভাষায় বক্তৃতা করে বিশ্ব দরবারে বাংলাভাষাকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যক্রম শুরু করেন।

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা দু'শ' নটিক্যাল মাইল ঘোষণা করেন। স্থলভাগের গ্যাস-তেল বাংলাদেশের নিজস্ব প্রযুক্তিতে ও সমুদ্র তলদেশের গ্যাস-তেল আহরণের কাজ বিদেশী দ্বারা শুরু করেন।

২৬ মার্চ ১৯৭৫। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই ভাষণই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের জনসভায় শেষ ভাষণ। এই ভাষণে দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচি ও অবদান সহজেই প্রতীয়মান হয়।

দেশবাসীর উদ্দেশে সেদিন বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন –

“আমার ভাই ও বোনেরা, আজ ২৬শে মার্চ। ২৫শে মার্চ রাত্রে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষকে আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল। সেদিন রাত্রে বিডিআরের ক্যাম্পে, পুলিশ ক্যাম্পে, আমার বাড়িতে ও বিশ্বাবিদ্যালয়ে এবং চারিদিকে আক্রমণ চালায় ও নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশবিক শক্তি নিয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ডাক দিয়েছিলাম। ৭ই মার্চ আমি তাদের প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে আবার আমি ডাক দিয়েছিলাম। আর নয়, মোকাবিলা কর। বাংলার মানুষ যে যেখানে আছ, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা কর। বাংলার মাটি থেকে শত্রুকে উৎখাত করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীন করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।
দুনিয়ার মানুষের কাছে আমি সাহায্য চেয়েছিলাম। আমার সামরিক বাহিনীতে যারা বাঙালি ছিল, তাদের এবং আমার বিডিআর, আমার পুলিশ, আমার ছাত্র, যুবক ও কৃষকদের আমি আহবান করেছিলাম। বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে মোকাবিলা করেছিল। ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছিল, শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল। দুনিয়ার জঘন্যতম ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানী শোষক শ্রেণী। দুনিয়ার ইতিহাসে এত রক্ত স্বাধীনতার জন্য কোনো দেশ দেয় নাই, যা বাংলার মানুষ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা পঙ্কিলতা শুরু করলো। যা কিছু ছিল ধ্বংস করতে আরম্ভ করলো। ভারতে আমার এক কোটি লোক আশ্রয় নিয়েছিল। তার জন্য আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। আমি তাদের স্মরণ করি, খোদার কাছে তাদের মাঘফেরাত কামনা করি, যারা এ দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে, আত্মহুতি দিয়েছে। আমি তদের স্মরণ করব, যে সকল মুক্তিবাহিনীর ছেলে, যেসব মা-বোনেরা, আমার যে কর্মীবাহিনী আত্মহুতি দিয়েছিল, শহীদ হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। এ দেশ তাদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যারা জীবন দিয়েছিল বাংলার মাটিতে, আজ তাদের কথাও স্মরণ করি।
এখানে একটা কথা। আপনাদের মনে আছে, পাকিস্তানীরা যাওয়ার পূর্বে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে ১৬ই ডিসেম্বরের আগে, কারফিউ দিয়ে ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় আমার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করব, সম্পদ ধ্বংস করব, বাঙালি স্বাধীনতা পেলেও এই স্বাধীনতা রাখতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা হয়েছে। বাংলার লোক স্বাধীন হয়েছে। বাংলার পতাকা আজ দুনিয়ায় উড়ে। বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য, কমনওয়েলথের সদস্য, ইসলামী সামিট-এর সদস্য। বাংলাদেশ দুনিয়ায় এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে, কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না।
ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি, জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি। আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আমরা জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি, কো-এক্জিস্টেনসে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তানীরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে, আমার সম্পদ ফেরত দেবে। আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের বিচার করবো। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাফ করেছি। তাদের আমি বিচার করি নি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এই জন্য যে, এশিয়ায় – দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানীরা আমার সম্পদ এক পয়সাও দিল না। আমার বৈদেশিক মুদ্রার কোনো অংশ আমাকে দিল না। আমার গোল্ড রিজার্ভের কোনো অংশ আমাকে দিল না। একখানা জাহাজও

আমাকে দিল না। একখানা প্লেনও আমাকে দিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ এক পয়সাও দিল না এবং যাওয়ার বেলায় পোর্ট ধ্বংস করল, রাস্তা ধ্বংস করল, রেলওয়ে ধ্বংস করল, জাহাজ ডুবিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত কারেন্সী নোট জ্বালিয়ে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানীরা মনে করেছিল, বাংলাদেশকে যদি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে দেখাতে পারব যে, তোমরা কি করছো।

ভুট্টো সাহেব বক্তৃতা করেন। আমি তাঁকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলাম লাহোরে আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল বলে। ভুট্টো সাহেব বলেন, বাংলাদেশের অবস্থা কি? ভুট্টো সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি ফ্রন্টিয়ারের পাঠানদের অবস্থা কি? ভুট্টো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি বেলুচিস্তানের মানুষের অবস্থা কি? এরোপ্লেন দিয়ে গুলী করে মানুষ হত্যা করছেন। সিন্ধুর মানুষের অবস্থা কি? ঘর সামলান বন্ধু, ঘর সামলান। নিজের কথা চিন্তা করুন। পরের জন্য চিন্তা করবেন না। পরের সম্পদ লুট করে খেয়ে বড় বড় কথা বলা যায়। আমার সম্পদ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। তোমরা আমার কি করেছ? আমি সবার বন্ধুত্ব কামনা করি। পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নাই। কিন্তু আমার সম্পদ তাকে দিতে হবে। আমি দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই, কারো সাথে দুশমনি করতে চাই না। সকলের সাথে বন্ধুত্ব করে আমরা শান্তি চাই।

আমার মানুষ দুঃখী, আমার মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়। আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে এলাম, তখন আমি শুধু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাংকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না, আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না, শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম। আমাদের গুদামে খাবার ছিল না। গত তিন-চার বৎসরে না হলেও বিদেশ থেকে ২২ কোটি মণ খাবার বাংলাদেশে আনতে হয়েছে। বাইশ শ কোটি টাকার মতো বিদেশ থেকে হেল্‌প আমরা পেয়েছি। সেইজন্যে যারা আমাদের সাহায্য করেছে সেই সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্রকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু আর একটা কথা। অনেকে প্রশ্ন করেন, আমরা কি করেছি? আমরা যখন ক্ষমতায় এলাম, দেশের ভার নিলাম, তখন দেশের রাস্তাঘাট যে অবস্থায় পেলাম, তাকে রিপেয়ার করবার চেষ্টা করলাম। সেনাবহিনী নাই, প্রায় ধ্বংস করে গেছে। পুলিশ বাহিনীর রাজারবাগ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই খারাপ অবস্থা থেকে ভাল করতে কি করি নাই? আমরা জাতীয় সরকার গঠন করলাম। আমাদের এখানে জাতীয় সরকার ছিল না। আমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ছিল না, বৈদেশিক ডিপার্টমেন্ট ছিল না, প্লানি ডিপার্টমেন্ট ছিল না। এখানে কিছুই ছিল না। তার মধ্যে আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে হল। যাঁরা শুধু কথা বলেন, তাঁরা বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে বলুন, কি করেছি! এক কোটি লোককে ঘর-বাড়ি দিয়েছি। রাষ্ট্রের লোককে খাওয়ানোর জন্য বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়েছে, ২২ কোটি মণ খাবার এনে বাংলার গ্রামে গ্রামে দিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হয়েছে।

এরপরও কথা আছে। আমি মানুষকে বললাম, আমার ভাইদের বললাম, মুক্তিবাহিনী ছেলেদের বললাম, তোমাদের অস্ত্র জমা দাও। তারা অস্ত্র জমা দিল। কিন্তু একদল লোক– আমার জানা আছে, যাদের পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল, তারা অস্ত্র দেয় নি। তারা এসব অস্ত্র দিয়ে নিরপরাধ লোককে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। এমনকি পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকেও তারা হত্যা করলো। তবুও আমি শাসনতন্ত্র দিয়ে

নির্বাচন দিলাম। কিন্তু যদি বাংলার জনগণ নির্বাচনে আমাকেই ভোট দেয়, তাহলে সেটা আমার দোষ নয়। ৩১৫ টি সিটের মধ্যে ৩০৭টি সিট বাংলার মানুষ আমাকে দিল। কিন্তু একদল লোক বলে, কেন জনগণ আমাকে ক্ষমতা দিল? কোনো দিন কোনো দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কাউকে এভাবে অধিকার দেয় না। কিন্তু অধিকার ভোগ করতে হলে তার জন্য রেসপনসিবিলিটি আছে, সেটা তারা ভুলে গেল। আমি বললাম, তোমরা অপজিশন সৃষ্টি কর। তারা তা সৃষ্টি করলো। বক্তৃতা করতে আরম্ভ করলো। দরকার হলে অস্ত্র দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করতে চায়। অস্ত্রের হুমকি দেওয়া হলো। মানুষ হত্যা থেকে আরম্ভ করে রেললাইন ধ্বংস করে, ফারটিলাইজার ফ্যাক্টরী ধ্বংস করে, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করলো যাতে বিদেশী এজেন্ট যারা দেশের মধ্যে আছে, তারা সুযোগ পেয়ে গেল। আমাদের কর্তব্য মানুষকে বাঁচানো। চারিদিকে হাহাকার। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের দাম আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। সমস্ত দুনিয়া থেকে আমাদের কিনতে হয়। আমরা তো কলোনি ছিলাম। দুইশ বছর ইংরেজদের কলোনি ছিলাম, পঁচিশ বছর পাকিস্তানের কলোনি ছিলাম। আমাদের তো সব কিছুই বিদেশ থেকে কিনতে হয়। কিন্তু তার পরেও বাংলার জনঘন কষ্ট স্বীকার করে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তারা তাদের এগোতে, কাজ করতে দেয় না।

আর একদল বিদেশে সুযোগ পেল। তারা বিদেশ থেকে অর্থ এনে বাংলার মাটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলো। স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করলো। আজ এদিনে কেন বলছি এ কথা? অনেক বলেছি, এত বলার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার চোখের সামনে মানুষের মুখ ভাসে। আমার দেশের মানুষের রক্ত ভাসে। আমার চেখের সামনে ভাসে আমারই মানুষের আত্মা। আমার চোখের সামনে সে সমস্ত শহীদ ভাইয়েরা ভাসে, যারা ফুলের মতো ঝরে গেল, শহীদ হল। রোজ কিয়ামতে তারা যখন বলবে, আমরা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করলাম, তোমরা স্বাধীনতা নস্যাৎ করেছো, তোমরা রক্ষা করতে পার নাই, তখন তাদের আমি কি জবাব দেব?

আর একটা কথা। কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য। কথা হল, এমন অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে যে, অফিসে যেয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, সাইন করিয়ে নেয়। ফ্রি স্ট্রাইল! ফ্যাক্টরীতে যেয়ে কাজ না করে টাকা দাবি করে। সাইন করিয়ে নেয়। যেন দেশে সরকার নাই। আবার শ্লোগান হল – বঙ্গবন্ধু কঠোর হও।

বঙ্গবন্ধু কঠোর হবে; কঠোর ছিল, কঠোর আছে। কিন্তু দেখলাম, চেষ্টা করলাম।

এত রক্ত, এত ব্যথা, এত দুঃখ। তার মধ্যে ভাবলাম দেখি কি হয়, কিছু করতে পারি কি-না। আবদার করলাম, আবেদন করলাম, অনুরোধ করলাম, কামনা করলাম, কিন্তু কেউ কথা শোনে না। চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আজকে যে সিস্টেম করেছি, তার আগেও ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর কম ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না, ক্ষমতা বন্দুকের নলে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে, 'বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও।' বঙ্গবন্ধু তারপর একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে দুঃখী মানুষকে ভালবেসে, বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষণহীন সমাজ কায়েম করবার জন্য।

দুঃখের বিষয়, তারা রাতের অন্ধকারে পাঁচজন পার্লামেন্টের সদস্যকে হত্যা করেছে, তিন-চার হাজারের মতো কর্মীকে হত্যা করেছে। আরেক দল দুর্নীতিবাজ টাকা-টাকা, পয়সা-পয়সা করে পাগল হয়ে গেছে। তবে যেখানে খালি দুর্নীতি ছিল, গত দুই মাসের মধ্যে সেখানে ইনশাআল্লাহ কিছুটা অবস্থার ইমপ্রুভ করেছে। দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য আজকে কিছু করা হয়েছে।

হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সিয়াল ফরম অব গভর্ণমেন্ট করেছি। জনগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। পার্লামেন্ট থাকবে। পার্লামেন্টের নির্বাচনে একজন, দুইজন, তিনজনকে নমিনেশন দেওয়া হবে। জনগণ বাছবে, কে ভাল কে মন্দ। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র, আমরা চাই না শোষকের গণতন্ত্র। এটা পরিষ্কার।

আমি প্রোগ্রাম দিয়েছি। আজকে আমাদের সামনে কাজ কি? আজকে আমাদের সামনে অনেক কাজ। আমি সকলকে অনুরোধ করব, আপনারা মনে কিছু করবেন না, আমার কিছু উচিত কথা কইতে হবে। কারণ, আমি কোনোদিন ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। সত্য কথা বলবার অভ্যাস আমার আছে। মিথ্যা বলবার অভ্যাস আমার নাই। কিন্তু কিছুটা অপ্রিয় কথা বলবো।

বন্যা হল। মানুষ না খেয়ে কষ্ট পেল, হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরে গেল। দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনলাম! পাঁচ হাজার সাতশ লঙ্গরখানা খুললাম মানুষকে বাঁচাবার জন্য। সাহায্য নিয়েছি মানুষকে বাঁচাবার জন্য। আমি চেয়েছিলাম স্বাধীনতা। কি স্বাধীনতা? আপনাদের মনে আছে, আমার কথার মধ্যে দুইটি কথা ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট ভরে ভাত খেতে না পারে, কাপড় পরতে না পারে, বেকার সমস্যা দূর না হয়, তাহলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে না।

আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয়, সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায়, সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে, সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না, তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে, তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রী করে, তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। আমি কেন ডাক দিয়েছি? এই ঘুনে ধরা ইংরেজ আমলের, পাকিস্তানী আমলের যে শাসন ব্যবস্থা, তা চলতে পারে না। একে নতুন করে ঢেলে সেজে গড়তে হবে। তাহলে দেশের মঙ্গল আসতে পারে, না হলে আসতে পারে না। আমি তিন বৎসর দেখেছি। দেখে-শুনে আমি স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছি এবং তাই জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে শাসনতন্ত্রের মর্মকথা।

আজকে জানি, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি জানি, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। আমার চেয়ে অধিক কে জানতে পারে? বাংলার কোন্ থানায় আমি ঘুরি নাই, বাংলার কোন জায়গায় আমি যাই নাই? বাংলার মানুষকে আমার মতো কে ভাল করে জানে?

আপনারা দুঃখ পান, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। আপনাদের গায়ে কাপড় নাই। আপনাদের শিক্ষা দিতে পারছি না। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস খাদ্য।

একটা কথা বলি আপনাদের কাছে। সরকারি আইন করে কোনোদিন দুর্নীতিবাজদের দমন করা সম্ভব নয় জনগণের সমর্থন ছাড়া। আজকে আমার একটি মাত্র অনুরোধ আছে আপনাদের কাছে। আমি বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, জেহাদ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। আজকে আমি বলব বাংলার জনগণকে– এক নম্বর কাজ হবে দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। আমি

আপনাদের সাহায্য চাই। কেমন করে করতে হবে? আইন চালাব। ক্ষমা করব না। যাকে পাব, ছাড়ব না। একটা কাজ আপনাদের করতে হবে। গণ-আন্দোলন করতে হবে। আমি গ্রামে গ্রামে নামব। এমন আন্দোলন করতে হবে যে, যে ঘুষখোর, যে দুর্নীতিবাজ, যে মুনাফাখোর, যে আমার জিনিস বিদেশে চোরাচালান দেয়, তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে মিটিং করে দেখতে হবে, কোথায় আছে, ঐ চোর, এ ব্লাকমার্কেটিয়ার, ঐ ঘুষখোর। ভয় নাই, কোনো ভয় নাই, আমি আছি। ইনশাল্লাহ আপনাদের উপর অত্যাচার করতে দেব না। কিন্তু আপনাদের গ্রামে গ্রামে আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলন করতে পারে কে? ছাত্র ভাইয়েরা পারে। পারে কে? যুবক ভাইয়েরা পারে। পারে কে? বুদ্ধিজীবীরা পারে। পারে কে? জনগণ পারে। আপনারা সংঘবদ্ধ হন। ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সে দুর্গ গড়তে হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করবার জন্য, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন করবার জন্য। এই দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এত চোর যে কোথা পয়দা হয়েছে, জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গেছে, কিন্তু এই চোর রেখে গেছে। এই চোর তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম। কিছু দালাল গেছে, চোর গেলে বেঁচে যেতাম।

দ্বিতীয় কথা, আপনারা জনেন, আমাদের দেশে এক একর জমিতে যে ফসল হয়, জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ বেশী ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল করতে পারব না, দ্বিগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না, ভিক্ষা করতে হবে না।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত নাই। একটা লোককে আপনারা ভিক্ষা দেন এক টাকা কি আট আনা। তারপর তার দিকে কিভাবে চান? বলেন, 'ও বেটা ভিক্ষুক। যা বেটা নিয়ে যা আট আনা পয়সা।' কোনো জাতি যখন ভিক্ষুক হয়, মানুষের কাছে হাত পাতে, মানুষকে বলে, আমাকে খাবার দাও, আমাকে টাকা দাও, তার তখন ইজ্জত থাকতে পারে না। আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না।

আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে– যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট পরা কাপড় পরা ভদ্রলোক, তাদের কাছেও চাই– জমিতে যেতে হবে। ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন আজ থেকে ঐ শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি, আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না। কারো কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে হবে না।

আমি পাগল হয়ে যাই চিন্তা করে। এ বৎসর, ১৯৭৫ সালে, আমাকে ছয় কোটি মণ খাবার আনতে হবে। কি করে মানুষকে বাঁচাব? কি করে অন্যান্য জিনিস কিনব? বন্ধুরাষ্ট্র সাহায্য দিচ্ছে বলে বেঁচে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না– আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে। ভাইয়েরা আমার, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে, তাহলে ২৫/৩০ বৎসরে বাংলায় কোনো জমি থাকবে না হাল চাষ করবার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সেইজন্য আজকে আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি

প্ল্যানিং করতে হবে। এটা হল তিন নম্বর কাজ। এক নম্বর হল– দুর্নীতিবাজ খতম করা। দুই নম্বর হল– কলে কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে প্রোডাকশন বাড়ান। তিন নম্বর হল– পপুলেশন প্ল্যানিং। চার নম্বর হল– জাতীয় ঐক্য।

জাতীয় ঐক্য গড়বার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাকে ভালবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে, সৎ পথে চলে– তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবে। যারা বিদেশী এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নাই। সরকারি কর্মচারীও এই দলের সদস্য হতে পারবে। কারণ তারাও এ জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এইজন্য সকলে– যে যেখানে আছি, একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে।

ভাইয়েরা, বোনেরা আমার, এই জাতীয় দলের আপাতত পাঁচটা ব্রাঞ্চ হবে। একটা শ্রমিক ভাইদের অঙ্গদল, কৃষক ভাইদের একটা, যুবক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা এবং মহিলাদের একটা। এই পাঁচটা অঙ্গদল মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। আমাকে অনেকে বলে, কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ তো হল। কিন্তু আমাদের কি হবে? আমি বলি আওয়ামী মানে তো জনগণ। ছাত্র, যুবক, শিক্ষিত সমাজ, সরকারি কর্মচারী – সকলে মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

শিক্ষিত সমাজের কাছে আমার একটি কথা। আমরা শতকরা কতজন শিক্ষিত লোক? আমরা শতকরা ২০ জন শিক্ষিত লোক। তার মধ্যে সত্যিকার অর্থে আমরা শতকরা ৫ জন শিক্ষিত। শিক্ষিতদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন। আমি এই যে দুর্নীতির কথা বললাম, তা কারা করে? আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না। আমার শ্রমিক? না। তাহলে ঘুষ খায় কারা? ব্লাকমার্কেটিং করে কারা? বিদেশী এজেন্ট হয় কারা? বিদেশে টাকা চালান দেয় কারা? হোর্ড করে কারা? এই আমরা, যারা শতকরা ৫ জন শিক্ষিত। এই আমাদের মধ্যেই রয়েছে ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। আমাদের চরিত্রের সংশোধন করতে হবে, আত্মশুদ্ধি করতে হবে। দুর্নীতিবাজ এই ৫ জনের মধ্যে, এর বাইরে নয়।

শিক্ষিত সমাজকে আর একটা কথা বলব। আপনাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। একজন কৃষক যখন আসে খালি গায়ে, লুঙ্গী পরে, আমরা বলব, 'এই বেটা কোত্থেকে আইছস, বাইরে বয়, বাইরে বয়।' একজন শ্রমিক যদি আসে বলি 'ঐখানে দাঁড়া'। 'এই রিক্সাওয়ালা, ঐভাবে চলিস না।' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের সাথে কথা বলেন। তাদের তুচ্ছ করেন। এর পরিবর্তন করতে হবে। আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনে দেয় ঐ গরীব কৃষক। আপনার মাইনে দেয় এ গরীব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়। আমরা গাড়ি চড়ি ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলুন, ইজ্জত করে কথা বলুন, ওরাই মালিক। ওদের দ্বারাই আপনার সংসার চলে।

ভাই ও বোনেরা আমার, আজকে আর একটা কথা বলি। আমি জানি, শ্রমিক ভাইয়েরা, আপনাদের কষ্ট আছে। কি কষ্ট, আমি জানি। তা আমি ভুলতে পারছি না। বিশেষ করে ফিক্সড ইনকাম গ্রুপের কষ্টের সীমা নাই। কিন্তু কোথায় থেকে কি হবে? টাকা ছাপিয়ে বাড়িয়ে দিলেই আপনারাও কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য হবেন। আপনারা প্রাণ দিয়ে কাজ করুন। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।"

বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণ

১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ । এ দিন ভোর রাতে কর্নেল ফারুক-রশিদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর কতিপয় অফিসার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাসভবনে গিয়ে তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরিবারের অন্যান্যরা হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেসা, বঙ্গবন্ধুর জৈষ্ঠ্যপুত্র শেখ কামাল, দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসেরকে হত্যা করা হয়। আরো হত্যা করা হয় ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর কন্যা বেবি সেরনিয়াবাত ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি, তাঁর স্ত্রী আরজু মণি, শিশুপুত্র সুকান্ত বাবু ও বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিলকে।

১৬ আগষ্ট বিকেলে টুঙ্গিপাড়ায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা (১৯৬৬-১৯৭১) - ড. কামাল হোসেন
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে - মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম
একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে - মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম
ইতিহাস কথা বলে - সৈয়দ নূর আহমদ
শতাব্দীর মহানায়ক শেখ মুজিব - মিজানুর রহমান
মহানায়ক - এম আর আখতার মুকুল
বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবনী - আহমাদ মাযহার
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ - সিকদার আবুল বাশার
ফেরারী ডায়েরী - ড. আলাউদ্দিন আল-আজাদ
একজন বঙ্গবন্ধুর গল্প - আবু হানিফ
দৈনিক ইত্তেফাক - শহীদ-স্মৃতিসংখ্যা
সাপ্তাহিক সমীক্ষণ - মেসবাহউদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট-এর জাতির জনক অ্যালবাম